প্রায়ান্ধের উইলো গাছ

সাকী মুখোপাধ্যায়

প্রতিবন্ধিতা যে প্রকারেরই হোক না কেন তা অনুভূতির এমন এক প্রগাঢ়তায় মানুষকে নিয়ে যায় যা সাধারণ নয়। প্রতিবন্ধীর সাফল্য সহজে আসে না। তবু যদি সাফল্য আসে সেটা এমন মূল্যে যা সাধারণ মানুষের অনুভূতির অগম্য। প্রতিবন্ধী অনুভূতি এত গভীর ও তীব্র হয় যার অতলতা সাধারণ্যে অস্পৃশ্য। আমি চলচ্চিত্র-বিজ্ঞ নই। লেখক তো নইই। এক প্রায়ান্ধ দর্শকের ভূমিকায় এক অন্ধ অধ্যাপকের কথা বলবো। কাহিনি আমার নিজের নয়, একটি বিশেষ ছায়াছবির পুনর্কথন। কোনো বিশ্লেষণে না গিয়ে আমি বলবো এই ছবিটির সাথে আমার একাত্মতার কাহিনি।

ছবির নাম 'The Willow Tree'। পরিচালক ইরানের মজিদ মজিদি । "রঙ-এ-খোদা" যাঁর অন্যতম সৃষ্টি।

অগুন্তি চলচ্চিত্রপ্রেমীদের আমিও একজন। তফাৎ এই যে নিতান্তই অল্পবয়সে আমাকে এক চোখে দৃষ্টি হারাতে হয়। আস্তে আস্তে অন্য চোখের দৃষ্টিরও অবনতি ঘটে। কিন্তু আর পাঁচটা কেজো মানুষের মতোই আমার দিনযাপন - ঘরে ও বাইরে। ফলত প্রতিনিয়ত সমস্যার মুখোমুখি হওয়া। শীতের রাতে তুষারপাতের মধ্যে গাড়ি চালিয়ে অফিস থেকে বাড়ি ফেরা এই মুহূর্তে আমার সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ। বরফের মধ্যে দুদিকের গাড়ি যখন তীব্র আলো ফেলে, হঙ্ক করে, নিজের ভেতরে এক পুঞ্জীভূত ক্রোধ ও অসহায়তা অনুস্রাবিত হতে থাকে। বিশেষ কারো উদ্দেশ্যে নয়। হয়তো নিজের অসহায়তাকেই। বাড়ি পৌঁছে প্রতিদিন বলি - 'থ্যাঙ্ক ইউ গড'! সুতরাং দৃষ্টি ফিরে আসার পর, অধ্যাপক ইউসেফের মধ্যে যে রাগ ও যন্ত্রণা, আমাকে একটুও অবাক করেনা। স্বাভাবিক জীবনের অনেক সুখ ও সুষমা থেকে উনি বঞ্চিত হয়েছেন যেকোনো অন্ধ মানুষের মতোই। তিনি বুঝতে পারেন তার সদৃষ্টি-জীবন অনেক অন্যরকম হতে পারতো। অন্ধত্ব জীবনযাপনে সে সীমাবদ্ধতা আরোপ করে, তা ওঁর কাছে যেরকম অসহ্য হয়ে ওঠে দর্শক হিসেবে আমার কাছেও। মূলত এইখানেই আমি অধ্যাপকের সমস্ত যন্ত্রণার অংশীদার। শুনেছি কবিতা জিনিসটাকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ক'রে নিয়ে পড়লেই তার সঠিক রস পাওয়া যায়। আমার এই সিনেমা-পাঠ সেইভাবেই কবিতার মতো। নিজস্ব।

ইউসেফের সাথে তার স্ত্রীর সম্পর্কের ওপর পরিচালক মজিদ মজিদি যেভাবে আলো ফেলেন, আর সেই আলো এত সূক্ষ্ম, যে তার সাথে নিজের মনোপরিবেশ কত জায়গায় মিলে যায়। দৃষ্টি ফিরে পাওয়ার পর তেহরানের বিমানবন্দরে ফিরে কাচের ওধারে অধ্যাপক দেখতে পান তার গোটা পরিবার অপেক্ষা করে আছে। নিজের পরিবার। সব আপনার লোক। তবু কত অচেনা। সবাই অচেনা। এমনকি নিজের মা। কেননা এই মুখগুলোকে সে প্রথম দেখছে। ইউসেফ মুখগুলো সারি দিয়ে দেখতে থাকে। একের পর এক। আর খুব আশ্চর্য যে তার মন কেবল নারীমুখ খুঁজতে থাকে। যখনই কাউকে সুন্দর লাগে, তার দৃষ্টি সেই মেয়েটির ওপর কিছুক্ষণ দাঁড়ায়, অথবা ফিরে আসে। এইভাবে তার দৃষ্টি নিজের স্ত্রীকে অনায়াসে পেরিয়ে পরির মুখের ওপর অনেকক্ষণ থেমে থাকে। নতুন পৃথিবী দেখছে সে। সবই তো নতুন। এমনকি নারী সৌন্দর্য। স্পর্শে সে তো নারীকে চিনেছেই। কিন্তু দেখেনি কখনো। সেই প্রথম দৃষ্টিতেই সে পরিকে কয়েক সেকেন্ডের জন্য নিজের স্ত্রী বলে ভুল করে। তারপর সে নিজের মাকে চিনতে পারে। সেই চেনার দৃশ্য যদি কোনো দর্শকের মন সজল না করতে পেরে থাকে, সেই দর্শকের সুস্থতা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগবে। মা-ই অধ্যাপক ইউসেফকে ইঙ্গিত করেন ওঁর স্ত্রীর দিকে। স্ত্রীর দিকে তার প্রথম তাকানোতে আমি কৃতজ্ঞতা দেখি। গভীর মমতা ও কৃতজ্ঞতা। তারপর সে যখন মুখ নামিয়ে মেয়েকে দেখে, খুশীতে উচ্ছল হয়ে যায়। এই সমস্ত অনুভূতির তীব্রতা, আমার মনে হয় এক প্রায়ান্ধ বা এক পূর্ব-অন্ধ যেভাবে বুঝতে পারবেন, অন্যলোকের পক্ষে ঠিক সেই অনুভূতির স্পর্শ পাওয়াটা শক্ত।

'দ্য উইলো ট্রি' ছবির একটি দৃশ্য

ফিরে পাওয়া দৃষ্টিশক্তিতে দেখা এই নতুন-পুরনো পৃথিবীর প্রতি ইউসেফের প্রেম, কৃতজ্ঞতা আস্তে আস্তে ফিকে হয়ে আসে। তার জায়গা নিতে থাকে হারানোর যন্ত্রণা, ক্ষোভ, ও চাহিদা। সে পরিকে কামনা করতে থাকে। স্ত্রীর থেকে দূরে সরে যায় মনে মনে। এখানে এমন এক পরিস্থিতি তৈরি হয় যে প্রায় সমস্ত নারীই ইউসেফের স্ত্রীর সাথে একটা আইডেন্টিফিকেশন খুঁজে পাবেন। এই জায়গায় এসে প্রায়ান্ধের চোখ দিয়ে সদৃষ্টি ইউসেফকে আমার সত্যিই অন্ধ মনে হতে শুরু করে। যতোটা অন্ধ সে অন্ধ অবস্থাতেও ছিলো না। ইরানী সমাজকে আমরা সাধারণত রক্ষণশীল বলে জানি, অথচ যেভাবে পুত্রবধূর নিঃশব্দ মুখ থেকেই তার দুঃখ পড়ে নিলেন ইউসেফের মা তার কোনো তুলনা নেই। ছবিটার এক মর্মস্পর্শী দৃশ্য শাশুড়ি-পুত্রবধূর ওই নির্বাক, সজল আলিঙ্গন।

'দ্য উইলো ট্রি' ছবির একটি দৃশ্যের মন্তাজ

যে দৃশ্যে ইউসেফের চোখের দৃষ্টি ফিরে আসে, প্রথম পার্থিব প্রাণের চিহ্ন নিয়ে আসে একটি পিঁপড়ে। ইউসেফ তাকে দেখে জানলার ব্লাইন্ডের একটি ফালির ওপর। সে একটি কর্নফ্লেক্স বা ওই জাতীয় খাবারের দানা নিয়ে চলে যায়। জীবনের সর্বসম্ভবতার প্রতীক হিসেবেই পিঁপড়েটি সেই দৃশ্যে আসে। তার শরীরের চেয়েও বড়ো দানাটিকে সামলে সে যেভাবে সিসিফাসের মতো এগিয়ে চলে, অন্ধ অধ্যাপক ইউসেফের স্ট্রাগলের সে এক বনসাই রূপ। এই পিঁপড়েটি কিন্তু আবার ফিরে আসে। এক অন্য দৃশ্যে, অন্য দিশায়। অধ্যাপক তখন পুনরায় অন্ধ। ফিরে এসে পিঁপড়েটি যেন এই দৃষ্টিচক্রকে সম্পূর্ণ করে। এই চক্রের মাঝের অংশটুকু ক্ষণিকের আলোয় ভরা। সে কালিক আলোয় ঘটে যাওয়া অধ্যাপকের জীবনের নানা উত্থান পতনের সঙ্গে আমার এই তীব্র একাত্মতা।

চিত্রসূত্রঃ Alchetron
Copyright © 2020 Saki Mukherjee, Published 31st Dec, 2020.